সঙ্গীত সাধক নজরুল

দিলীপ কুমার রায়

কাজীর সম্বন্ধে এ-সংক্ষিপ্তি আমাকে দুঃখ দিত যদি না তার সম্বন্ধে অনেকেই ইতিমধ্যে সে সব কথা লিখে প্রকাশ না করতেন। কিন্তু সংক্ষিপ্তির কিছু ক্ষতিপূরণও মেলে। কাজীর কয়েকজন ভক্ত উৎসাহের আতিশয্যে তার এমন অনেক কবিতার জয়ধ্বনি করেছেন যাতে তার লাভ না হয়ে ক্ষতিই হয়েছে। তবে ভক্তের অতিভক্তি অনেক সময় বিপর্যয় আনে– একথা সবাই জানেন। তাই আমি শুধু তার গুণের কথাই বলব– অর্থাৎ এমন কথা যা পড়লে মন খুশী হয়, হৃদয় ভরে ওঠে গৌরবের সৌরভে, যে এমন একজন গুণী আমাদের মধ্যে জন্মেছিলেন এ যুগে যাঁর ওজস কারুণ্য ও সর্বোপরি ভক্তি সঙ্গীত মনপ্রাণকে মাতিয়ে দিতে পারে এ নাস্তিক যুগেও। এইখানে তার কবিশক্তির একটি মস্ত কৃতিত্ব। কাজীকে চিরদিন আমি স্নেহ করে এসেছি অনুজেরই মতন। সেও আমাকে অগ্রজের মতনই শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসতো। স্বভাবে সে অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। যেখানেই যে ''পরকে করিত নিকট বন্ধু'' –এ একটুও অত্যুক্তি নয়। এমন দিলদরিয়া প্রাণ নিয়ে খুব কম মানুষই জন্মায়। মজলিসি সভাসদ, হাসিগল্পে আনন্দদাতা, গায়ক, আবৃত্তিকার, সুরকার, গুণীর গুণগ্রাহী, উদার, সরল– এমন মানুষ যে কোন দেশে যে কোন যুগেই বিরল। সে যখনই আমাদের সভার আসরে আসত হেঁটে আসত না, আসত ছুটে– যেন দম্‌কা হাওয়ার মতন–অট্টহাস্য ছিল তার যেন কণ্ঠ ও নিষাদের নিজস্ব ছন্দ।

এক সময় আমি তার নানা গানই গাইতাম, বিশেষ করে প্রেমের গান, যথা, বাগচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল, বসিয়া বিজনে কেন, একা মনে পানিয়া ভরণে চলে লো গোরী, এত জল ও কাজল চোখে ইসারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী, করুণ কেন অরুণ আঁখি, গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু, প্রভৃতি। এ গুলির মধ্যে কয়েকটি কাজী নিজের হাতেই আমার খাতায় লিখে দিয়েছিল যে খাতাটি আজো আমার কাছে। কাজীর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের গৌরব স্মৃতির মাধ্যমে চাখতেই একবার উল্লেখ করলাম। আশা করি উৎসাহ নিন্দনীয় বলে গণ্য হবে না।

কাজীর সঙ্গে আমার আর একটি মস্ত মিল ছিল এই যে, তার গানে সুরবিহারের স্বাধীনতা সে আমাকে সানন্দেই দিত, যেমন দিতেন আমার পিতৃদেব ও অতুলপ্রসাদ। এ নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে আমার মতভেদে কাজী ও অতুলপ্রসাদ দুজনেই ছিলেন আমার দিকে। আজ শুনি একদল ক্রিটিকের মুখে যে এ স্বাধীনতা অক্ষমনীয়। কিন্তু অতুলপ্রসাদ ও কাজীর অনুমতি পাওয়ার পর এসব রক্ষ ক্রিটিকদের মাথানাড়া উপেক্ষা করা চলে। কাজী আমার মুখে তার গানের নানা সুরবিহারে এতই খুশী হত যে তার 'বুলবুল' কাব্য গ্রন্থটির প্রথম ভাগ আমাকেই উৎসর্গ করে। সে যুগে আমার বাংলাগানের পাঁচটি ধারা ছিল; পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলালের, অতুলপ্রসাদের, রজনীকান্তের, কাজী ও আমার নিজের। পন্ডিচেরি চলে আসার আগে আমি সবচেয়ে বেশী গাইতাম অতুলপ্রসাদ ও কাজীর গান। মনে পড়ে কত আসরে এ দুই সুরকারকেই এক সঙ্গে আমরা শুনিয়েছি তাঁদের রচিত গান। এ সৌভাগ্য কজন গায়কের হয়েছিল জানি না। তবে যাঁদের হয়েছে তাঁদের কাছে এ স্মৃতি থাকবেই অনুপমেয়– বিশেষ করে এ জন্যে; অতুলপ্রসাদ ও কাজী শুধু গায়কই ছিলেন না, ছিলেন আদর্শ শ্রোতা তথা সমজদার।

কাজীর গান! সে একটা যুগ গেছে। মনে পড়ে–রামমোহন লাইব্রেরীতে সুভাষ ও দেশবন্ধুর পদার্পণ। তারপরই কাজীর আবির্ভাব ও ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে গাওয়া, এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল/ এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল।

রামমোহন লাইব্রেরীতে, ওবারটুন হলেও য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আমি মাঝে মাঝেই 'চ্যারিটি কনসার্ট' দিতাম নানা অর্থার্থীর সাহায্যার্থে। সেবার ছিল বোধ হয় ডেটিনিউদের সাহায্যার্থে– ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু তো ভুলতে পারিনি কাজীর এই শিকল পরার গানে দেশবন্ধু ও সুভাষ বিচলিত হয়ে উঠেছিল–বিশেষ করে যখন সে গাইল, ''ওর ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝন্‌ঝনা, /ওযে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা!/ এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছ লাঞ্ছনা,/ মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।

দধীচির আত্মোৎসর্গের ফলেই দেবতার রাজ্যরক্ষা হয়েছিল। এই সার্থক উপমার কি তুলনা আছে? এ উপমা আসে উপর থেকে - যাকে শ্রীঅরবিন্দ তার Future Poetry -তে নাম দিয়েছেন শ্রুতি। ঠিক এমনি প্রেরণা নেমে এসেছিল তার বিদ্রোহী মনে বিদ্রোহ-বন্দনায়, ''আমি সেই দিন হব শান্ত/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।/ অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম-রণ ভূমে রণিবে না! / বিদ্রোহী রণক্লান্ত/ আমি সেই দিন হব শান্ত।''

কিন্তু যা বলছিলাম। দেশবন্ধু ও সুভাষের মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল এর পরে কাজীর মুখে বিদ্রোহী আবৃত্তি শুনেও, 'বল বীর/ বলল উন্নত মম শির!/ শির নেহারি আমারি, নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির!''

বিদ্রোহী হওয়া সহজ নয় এ সংসারে। মানুষ পারৎ -পক্ষে কাউকে বলতে চায়না যে সে অন্যায় করেছে। থাকতে চায় নিজেরটি নিয়েই সুখে দুঃখে– They take life as they find it–বলে সাহেব পুরাণে। কিন্তু কাজী ছিল স্বভাব বিদ্রোহী born rebel মেলামেশায় দহরম মহরমে তার জুড়ি ছিল না বটে কিন্তু ঐ সঙ্গে অসামাজিক কথা বলতেও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না কেউ এ যুগে এক মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া। অত্যাচার, কপটতা, ভন্ডামি, ন্যাকামি, গোঁড়ামি এ সবের প্রতি এরা দুজনেই ছিলেন খড়গ হস্ত। কিন্তু কাজীর বিদ্রোহ ছিল যে আরো অগ্নিময়, ঘরোয়া, তীব্র। যখন সে গাইত তার ঝাঁকড়া বাবরী চুল দুলিয়ে, ''জাতের বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া!/ ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া?/ বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন সে জাত!/ কোন্ ছেলের তার লাগছে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ?/ নারায়ণের জাত যদি নাই/ তোদের কোন জাতের বালাই?/ (তোরা) ছেলের মুখে থুতু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া।''

তখন আমাদের বুকের মধ্যে কিসের বান ডেকে যেত বলা ভার - দুঃখ, খেদ না ভন্ডামির প্রতি ক্রোধ, কুসংস্কারের অগৌরব? কেবল একটা কথা বলা যায় যে, আমরা সবাই অভিভূত হ'য়ে পড়তাম তার আশ্চর্য প্রকাশ ভঙ্গিতে: এ ধরনের চরণ কি স্বভাবপ্রতিভাধর ছাড়া আর কারও কলমে এমন স্বতোৎসারে বইতে পারে? কাজী বিদ্রোহী কবি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্ভেজাল কবি। তাই বুঝি তার বিদ্রোহী মানুষের মনে ছোঁয়া

লাগাতে এ ব্যাপক ভাবে! কত সভায়ই এবং চ্যারিটি কনসার্টে সে আমাদের গানের পরেই এই ভাবের নানা গান গাইত ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ভাঙা গলায়। কিন্তু এমন গাইত যে ভাঙা গলাকেও ভাঙা মনে হ'ত না– এমনিই আগুন ছুটিয়ে দিত সে। এমন প্রাণোন্মাদী গায়ক কি আর দেখব এ মনমরা যুগে? সত্যি আমাদের অবাক লাগত এসবে- এ ভাঙা গলায় কাজী কোন যাদুতে এমন অস্বভাবকে সম্ভব করত দিনের পর দিন-ভাবের আগুনে পাথরে বুকে আলোর ঝর্ণা বইয়ে!

একটা টুকরো স্মৃতি মনে পড়ে গেল: সুভাষ একবার আমাকে বলেছিল: ভাই, জেলে যখন লোহার দরজা বন্ধ করে ওয়ার্ডার, তখন বার বার মনে পড়ে কাজীর ঐ গান, ''কারার ঐ লৌহ কপাট/ ভেঙে ফেল কর রে লোপাট/ শিকল-পূজার পাষাণ বেদী!''

মান্দালয় থেকে একটি পত্রে সে কতকটা আভাস দিয়েছিল একবার। লিখেছিল (২মে, ১৯২৫),

I do not think that I could have looked upon a convict with the authentic eye of sympathy hadn't I lived personally as a prisoner. And I have not the least doubt that the production of our artists and litterateurs, generally, would stand to gain in ever so many ways could theywin to some new experience of prison life. We do not perhaps realise the magnitude of the debt owed by Kazi NazrulIslam's verse to the living experience he had of jails.

(ভাবার্থ: আমি কয়েদীদের দরদী হতে পারতাম না যদি জেলে না যেতাম। আমার মনে হয় শিল্পী ও সাহিত্যিকদের অনেক কিছু লাভ হবেই হবে যদি তাদের জেল জীবনের অভিজ্ঞতা থাকে। কাজীকে জেলে যেতে হয়েছিল –এ অভিজ্ঞতা থেকে তার কাব্য কতখানি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বোধহয় আমরা আজও উপলব্ধি করি নি।)

একথা পুরোপুরি সত্য হোক বা না হোক একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে জেলে না গেলে কাজী কখনই লিখতে পারত না এমন প্রাণ জাগানিয়া চরণ, ''তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,/ সেই ভয়েই টুটিই ধরব টিপে, করব তাদের লয়,/ মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়,/ মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল।''

দিল্লিতে নেতাজী স্মৃতিসভায় গেয়েছিলাম (ডিসেম্বর ১৯৬৪) কাজীর একটি গান যা সুভাষ অত্যন্ত ভালবাসত, ''দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার/ লঙ্ঘিতে হলে রাত্রি - নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।''

কাজী যখনই এই গানটি গাইত মনে পড়ে সুভাষের মুখ আবেগে রাঙা হয়ে উঠত– বিশেষ করে সে শেষ স্তবকের দুটি অমর চরণ ধরতে না ধরতে, ''ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান/ আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান?

ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়ার এ চরণটি ধরতে না ধরতে মন সম্ভ্রমে উল্লাসে ভরে ওঠে। এ রকম চরণ কলাকৌশলে আসেনা, কাব্যসাধনায়ও নয়– আসে কেবল আলোকলোকের প্রেরণার অবতরণে। কাজীর নানা কবিতায়ই পাওয়া যায় এই দিব্যপ্রেরণা– বিশেষ ক'রে ওর নানা শক্তির গানে। তাই ওর ভক্তির গানের কথা বলি– আলো এই জন্য যে ওর ভক্তি সঙ্গীতের সম্বন্ধে ওর ভক্তবৃন্দ প্রায় সবাই নীরব, নীরব এই জন্যই যে, এ যুগে ভক্তি গানের কোন সঠিকতার আদর নেই। আমি পন্ডিচেরি থেকে ফিরে যখন কলকাতায় ভক্তির গান গাইতাম তখন এক সাংঘাতিক ইদানীন্তন কবি হেসে মন্তব্য করেছিলেন: 'দিলীপবাবুর ওসব কৃষ্ণরাধা শিবদুর্গার গান ও যুগে অচল। এ কথা শ্রী অরবিন্দকে বলতে তিনি আমাকে লিখেছিলেন পাল্টা হেসে,

But what a change in India! Once religious and spiritual poetry held the frist place-Tukaram, Mirabai, Tulsidas, Suradas, Kavir, Tyagraj and Tamil mystic poet and a number of others - and now spiritual poetry is not poetry, altogether 'achal'!! But likely things are 'sachal' in this world and this 'movabitlity' may bring back the older and wonder feeling.

(ভাবার্থ : ভারতবর্ষে কী দারুণ যুগই এসেছে! একদা ভক্তিকাব্যের স্থান ছিল সবার উপরে - তুকারাম, মীরাবাই, তুলসীদাস, সুরদার, কবীর, ত্যাগরাজ, তামিল ভক্ত কবিগোষ্ঠী ইত্যাদি–আর আজ ভক্তিকাব্য হয়ে দাঁড়ালো কি না 'অচল'!! তবে ভরসা এই যে, দিনদুনিয়ায় সবকিছুই ''সচল''। তাই হয়ত এই সচলতার ফলেই বিগত যুগের গভীরতম মুল্যায়ন ফিরে আসবে!)

অনেকের ধারণা কাজী ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিলেন বলেই ওঁর মাথা খারাপ হল। একদা শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রীর এই উক্তি কোন ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলতে তিনি বলেছিলেন হেসে যে, যিনি চৈতন্যময় করুণাময় সত্তা যাঁর আলোতে ভুবন আলো তাঁকে চিন্তা ক'রে কি কেউ পাগল হ'তে পারে? (ঠাকুর 'বেহেড' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন– শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত দ্রষ্টব্য)।

এই উদ্ধৃতিটি অবান্তর নয়– আরো এই জন্য যে, আমার মনে হয়, কাজীর প্রতিভার পরম পরিণতির পর্বে সে যেসব অপরূপ ভক্তির গান বেঁধেছিল তাদের আদর হয়নি আগে। কাজী নিজে আর এ গানগুলি তার চমৎকার আবেগময় সুরে গাইলে আজ অনেকেই হয়তো বুঝবার কিনারায় অন্তত আসতেন যে, কাজীর মধ্যে ভগবতী করুণায় অবতরণ হয়েছিল বলেই সে বেঁধেছিল অসংখ্য ভক্তির গান, না বেঁধে পারেনি। এদের মধ্যে অনেকগুলি গানেরই ভাব ভাষা ও ছন্দ অতি মর্মস্পর্শী। দু-একটা উদাহরণ না দিলেই নয়। আর একটি গান আছে, ''তুই পাষাণগিরির মেয়ে হলি/ পাষাণ ভালোবাসিস বলে/ গলবে কি তোর পাষাণ হৃদয় / তপ্ত আমার নয়ন জলে?

আন্তরিকতায় মন ভিজে ওঠে শুধু পড়লেই, না জানি সুর শুনলে আরো কত সহজে মন গলত! এরই পরে একটি শ্লোকের বাঁধুনি কী যে মধুর/ 'কোটি ভক্ত যোগী ঋষি ঠাঁই পেল না তোরে চরণে/ তাই ব্যথায়-রাঙা তাদের হৃদয় জবা হ'য়ে ফোটে বনে।

কিন্তু শুধু মধুর গানই তো নয়, কাজী ছিল শক্তিমান পুরুষ-তন্ত্রের পরিভাষায় স্বভাবশাক্ত, তাই তো পারল এমন বলিষ্ঠ চরণের সঙ্গে কোমল ভাবের জোড় মেলাতে, ''তোর শক্তিপ্রসাদ পেয়ে মানুষ হবে অমরসেনা।/ দিব্য জ্যোতির দেহ পাবে দানব অসুর ভয় রবে না।/ এই পৃথিবী ব্যথাহত শ্বেত শতদলের মত / পুষ্পাঞ্জলি হ'য়ে মা তোর উঠবে ফুটে সে সাগরে/ ভাগীরথী ধারার মত সুধার সাগর পড়ুক ঝ'রে।''

ইংরাজী ভাষায় কাব্যের শিখর গানের শিখরের চেয়ে উঁচু। ওদের শ্রেষ্ঠ বাণী মেলে কাব্যে - বিশেষ করে অমিত্রাক্ষরে। কিন্তু ভারতে - আরো বেশী করে বাংলাদেশের কাব্যের শিখর মহিমা দীপ্ত হয়ে ওঠে গানেই বলব। এ আমার কথা নয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা। আমার পিতৃদেবের মুখেও শুনতাম এই কথাই। একদিন বলেছিলেন তিনি: 'ওরে পরে বুঝবি আমি কী সব গান রেখে গেলাম।' রবীন্দ্রনাথ প্রায় বলতেন

তার শ্রেষ্ঠ দান তার গান। মহাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ এ কথায় পুরোপুরি সায় দিতেন।

এই সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে অনেক লিখেছি যে: বাঙালী কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি চিরদিনই ফুটে উঠেছে তার গানে। বাংলাদেশের মাটি গানের অশ্রান্ত জোয়ারে আজও উর্বর। গঙ্গার ভাঁটার মধ্যেও যে স্রোত আবিল হয়নি, যুক্তি তর্ক বিজ্ঞানের মতি দাপটে শুকিয়ে যায়নি। শুধু বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, শশিশেখর, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ ভক্ত গীতিকারই নন, হাজার হাজার আউল বাউল সারি ভাটিয়ালী কথকতাবর্গীয় ভক্তি সঙ্গীত আমাদের মনের আকাশে বাতাসে নিরন্তর ভাটিয়ালী চলাফেরা ক'রে আসছে, যার ফলে একটু উধর্বদৃষ্টি হ'তে আকাশের সত্যও আমাদের মনের কান কান কথা কয়, আর অমনি শ্রেষ্ঠ বাঙালী ভক্তকবির মন গান গেয়ে ওঠে (দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়), এখন বড় শ্রান্ত আমি ওমা কোলে টেনে নেনা/ যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো।

কাজীর ছিল এই শ্রেণীর মন - স্বভাবপ্রবুদ্ধ কবিপ্রাণ, সহজ বিশ্বাসী অন্তর ও সর্বোপরি অসামান্য প্রতিভা যার আবাহনে দিগন্তে অসীমের শুভ্রালোকের সঙ্গে মর্তের অসীম আঁধারের মিলনবাণী তার মনে জন্ম দিত অনন্যতন্ত্র ছন্দ - ভাষার কল্প - লোক। এ কথার একটি পরম পরিচয় আমি সে যুগেই পেয়েছিলাম যখন সে ধর্মের দিকে পা বাড়ালেও সীমান্ত পেরোয়নি। লিখেছিল একটি অপরূপ সপ্তমমাত্রিক শিবস্তোত্র, বসিয়েছিল মালকোষ ধামার। এ গানটি আমারও অতুলপ্রসাদের একটি বিশেষ প্রিয় গান ছিল, আমি গাইতাম প্রায়ই তার কাছে। শিবের এমন উদাত্ত - ঝঙ্কার স্তোত্র এ যুগে সত্যিই বিরল,

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু। / নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু।/ সে নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্তনে/ সাগর ছুটে আসে গগন প্রাঙ্গণে,/ আকাশে শূল হানি' শুনাও নববাণী,/ তরাসে কাঁপে প্রাণী প্রসীদ শম্ভু! ললাট শশী টলি' জটায় পড়ে ঢলি।' / সে-শশী চমকে গো, বিজলি ওঠে ঝলি।/ ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,/ মুরছে ভয়ভীতা নিশি নিরঞ্জনা,/ আঁধারে পথহারা চাতকী কেঁদে সারা, / যাচিছে বাহিধারা ধরা নিরম্বু।

মিল ছন্দ উপমা সব জড়িয়ে কী অপূর্ব ছবিই না ফুটে ওঠেছে এ জমকালো গানটিতে। পাখোয়াজে ধামারে গাইতে গাইতে শুধু যে আমিই উচ্ছ্বসিত হয়েউঠতাম তাই নয়, শ্রোতাদেরও মন সম্ভ্রমে ভ'রে উঠত যার ইংরেজী নাম awe। এমন শক্তিস্পন্দিত গান বাংলা ভাষায় বিরল। তাই আরো দুঃখ হয় ভাবতে যে কাজী তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের দীপ্ত লগ্নেই নীরব হলেন কর্মফলে– যার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া দুরূহ। সাধনার পথে সাধকের বিশেষ সাবধান হতে হয়। কিন্তু সে অন্য কথা।

এর পরেই তার জীবনের মোড় ফিরল ভক্তি সাধনার দিকে। ফলে একের পর এক কত গানই না সে বাঁধল। এই সময়ের পন্ডিচেরী প্রস্থান করি বলে কাজীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আর হয়নি। পন্ডিচেরি থেকে এসে একবার মাত্র তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বড় শোকাবহ পরিবেশে। তার বর্ণনা নিষ্ফল, তাই যাতে লাভ আছে তাতেই মন দিই, বলি কাজীর ভক্তি-সঙ্গীতের কথা। তার সব গান রসোত্তীর্ণ না হলেও বহু গানই উদ্ধৃতিযোগ্য, কিন্তু স্থানাভাবে মাত্র কয়েকটি কথা বলব। কিন্তু একটু ভূমিকা আছে।

মানুষের মনে প্রথম বৈরাগ্যের সুর ভেসে আসে, যখন সংসারের খেলা মনে হয় মায়ার খেলা। পরে সে দেখে যে মায়া নয় কিছুই। দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও এ সুর বেজেছিল, তার অনেক গান: শুধু দু'দিনের খেলা, আমরা, বলে ভাবি, জীবনটাতো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল...ইত্যাদি। কাজীর গানের মঞ্জুষা ঢুঁড়লে এ শ্রেণীর উদাসী গান নিশ্চয় মিলবে একের পর এক। আমি শুধু দুটি উদ্ধৃতি করি (বুলবুল), একুল ভাঙে ও-কূল গড়ে, এইতো নদীর খেলা/ (রে ভাই) এ তো বিধির খেলা।/ সকালবেলা আমীর রে ভাই, ফকির সন্ধ্যাবেলা।/ (সেই) নদীর ধারে কোন ভরসায়/ (ওতে বেভুল) বাঁধলি বাসা সুখের আশায়/ (যখন) ধরল ভাঙন পেলি নে তুই পারে যাবার ভেলা।/ (এই) দেহ ভেঙে হয় রে মাটি, মাটিতে হয় দেহ, / (যে) কুমোর গড়ে সে দেহ-তার খোঁজ নিলনা কেহ। (রাতে) রাজা সাজে নাট মহলে/ (দিনে) ভিক্ষা মেগে পথে চলে/ (শেষে) শ্মশানঘাটে নিয়ে দেখে সবই মাটির ঢেলা/ এই তো বিধির খেলারে ভাই, ভবনদীর খেলা।"

সংস্কৃতে বলে : 'চলচ্চিত্তং চলদ্দিত্তং চলজ্জীবন - যৌবনম্।" সংসারের সব কিছুই চঞ্চল ক্ষণিক,

'নলিনী দলগত জলমতি তরলম–তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্"

–পদ্মপাত্রে শিশির বিন্দুর মতন মানুষের জীবন টলমল টলমল করছে, কখন ঝরে যাবে পাপড়ির সঙ্গে কেউ কি জানে? যেখানে সব কিছুই অস্থায়ী, সেখানে মানুষের মন ব্যথিয়ে ওঠে, বলে–ক্ষণিকের হাটে কী বেসাত করব? আমি যে চাই চিরদিনের সঙ্গে লেন দেন–ইংরেজীতে একটি বিখ্যাত গান আছে,

Abide with me, fast falls the eventide/The darkness deepens, Lord, with me abide!/ When other helpers fail and comforts flee/ Help of tthe helpless oh abide with me!

থেকো প্রিয় পাশে সাঁঝছায়া আসে নেমে/আঁধার ঘনায় প্রভু থেকো পাশে প্রেমে।/ সকলি ফুরায়ে যায় কাল সবই নাশে/ হে চিরন্তন থেকো হে আমার পাশে।

এ ভাব বিশ্বজনীন, কেন না মানুষের অন্তরে শাশ্বতের জন্য পিপাসার্ত সার্বভৌম দুরাশা সর্বকালীন। ফরাসী ভাষায় একটি নিটোল সুন্দর গান আছে সেটি মানবজীবনের সবকিছুরই এই ক্ষণস্থায়িত্ব নিয়ে,

Lavie est vaine!/un peu d'amour,/Un peu de haine, /Et puis bonjour!/lavie eat breve! Un peu de reve/ Et puis bonsoir!

জীবন বিফল মেলা! ক্ষণিক হায় জীবন!/ একটু বিরাগ - দ্বেষ, একটু আশায় বাতি,/ একটু প্রায়-খেলা/ একটু সুখ-স্বপন, / তারপরে দিন শেষ। তার পরে ছায় রাতি।

আমার বলবার উদ্দেশ্য–এ মায়াবাদ শুধু আমাদের দেশেরই ব্যাধি নয়, দেশে দেশে কালে কালে বহু শ্রেষ্ঠ মনই এ গান গেয়েছে নানা সুরে নানা তালে, আর, তাতে মন সাড়া দিয়েছে এই জন্যে যে ভগবানকে না পেলে সত্যিই এ সবই মিছে– Lavie est vaine vainty, vanity, all this vanity !

তাই ভগবানের দিকে তীর্থযাত্রা শুরু হয় সব দেশেই এই বৈরাগ্যের তাগিদে রবীন্দ্রনাথের নানা বিখ্যাত গানেও এই নির্দেশ শান্ত নিটোল

সুর বেজেছে, এই কথাটা ধরে রাখিস - মুক্তি তোরে পেতেই হবে/ যে পথ গেছে পারের পানে, সে পথে তোর যেতেই হবে। অথবা দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে/ (আমার) সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই না তোমারে।

অতুলপ্রসাদেরও নানা ভক্তির গানে এ সুর বেজেছে, হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে?/ আমার মনের মাঝে সকল কাজে মালিক হয়ে রবে? বা ওগো সাথী চিরসাথী আমি সেই পথে যাব সাথে/ যে পথে পাখীরা যায়গো কুলায়,/ যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়/ যে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির রাতে।

রজনীকান্তের গানে এই বৈরাগ্যের সুর আরো পরিস্ফুট, (কবে) তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমরা রসাল নন্দনে?/ (কবে) তাপিত এ চিত হইবে শীতল তোমারি করুণা চন্দনে?

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বলাকার কবিতার ধুয়ায়, বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে/ হেথা নয় হেথা নয় আর কোন খানে।

কাজেই যাঁরা বলেন কবিগুরু জীবন দর্শনে একটি মাত্র সুরই বেজেছে– 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' –তারা ভুল বলেন। সবদেশেই জীবনের চঞ্চলতা, নানা অসারতা, ব্যথা বহুলতা, শক্তির অপচয়, বিশ্বাসের বঞ্চনা, সত্যভঙ্গ, কূলে এসে তরী ডোবার দৃশ্য মানুষের মনের এই চাপা কান্নাকে ফুটিয়ে তোলে যে, যা পেয়েছি তাতে মন ভরছে না,

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে/ শূণ্য ঘাটে একা আমি পার করে লও খেয়ার নেয়ে।

কাজীর কবিমন শ্রেষ্ঠ মনের পর্যায়ে পড়ে, তাইতো তার মনেও যশের শিখর মুহূর্তে এই সুর বেজে উঠেছিল– এই বৈরাগ্যের সুর যে, জীবনে আরো কিছু পেলেও কারুর পরেই নির্ভর করা যায় না, তাই তুমি এসোঃ তুমি না এলে মিটবে না আমার পিপাসা সংসারের সমৃদ্ধির মাঝে, তাসের ঘর নিয়ে। বন্ধন কারায় আমাকে আর রেখো না বন্দী করে (গীতি শতদল)

বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু, আর তো হব না পথহারা।/ বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়, তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা।/ ভ্রান্ত পথের শ্রান্ত পথিক লুটায় তোমার মন্দিরে, / আরো যাহা কিছু আছে মোর প্রিয় লয়ে বাঁচাও এ বন্দীরে।/ কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা, কী হবে লয়ে এ তাসের ঘর, / ছুঁতে ভেঙে যায়, তবু শিশু-প্রায় ভুলাও মোদের নিরন্তর। / তাই মুক্তি চাই তোমার আনন্দনন্দনে,/ ডাকি লও মোরে মুক্ত আলোকে তব আনন্দ নন্দন লোকে/ শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর সহে না এ বন্ধন কারা।/ বন্ধু স্বজন সব ছেড়ে যায়, তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা।

এ সুর অকারণে আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে রণিয়ে ওঠে যারা অল্পের সেবা ক'রেই তৃপ্ত থাকে, তাদের কানে 'নাল্পে সুখমস্তি'র শঙ্খধ্বনিও বাজেনা, বৃন্দাবনের অকুলবাঁশির আয় আয় ভাবও তাদের কুল ছাড়ায় না। এখানেই আসে ভগবানের কৃপা কথা: যাকে তিনি বরণ করেন সেই তার শরণ পায়। এ কথা উপনিষদে বলেছে সে কবে– 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য:।' অন্যভাবে বললে বলা যায় যাদের মন বেশি বিকশিত (evolved), তারাই ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের অভিসারে উধাও হতে যায়। আর এ উধাও হবার প্রথম পদক্ষেপ হয় বৈরাগ্যের টানে। তাই 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' এ কথা রবীন্দ্রনাথের মুখে মানালেও রামশ্যাম যদু মধুর মুখে মানায় না, যারা পুঁজি আঁকড়ে থাকতে চায় ভয়ে– তাদের রবীন্দ্রনাথও কিছু কম ধমকাননি,

সুখের আশা আঁকড়ে ল'য়ে থাকিসনে তুই ভয়ে ভয়ে,/ জীবনকে তোর ভ'রে নিতে মরণ আঘাত পেতেই হবে।

কাজীর মন এ জাতের নয়, ভয়ে ভয়ে কোনো কিছু আঁকড়ে থাকার পাত্র সে নয়, সে এপারে আদৌ তৃপ্তি পায়ইনি যে, কেমন করে বলবে আমি যা পেয়েছি তাই নিয়ে ঘর করবো? তাই তার ভক্ত প্রাণ কেঁদে উঠল (গীতি শতদল),

কেমন তব রূপ দেখিনি হরি,/ আপন মন দিয়ে তোমারে গড়ি,/ হাসো না কাঁদো তুমি সে রূপ হেরি/ বুঝিতে পারি না- তাই কাঁদে প্রাণ।

এ কথামালা গেঁথে করতালি পাওয়ার আশা নয়, এরই নাম খাঁটি দুরাশা, অভীপ্সা– aspiration: আমি তোমাকে যেরূপে কল্পনা করছি তাতে তুমি খুশি তো? না হলে আমি কি করব প্রভু? কেমন করে তোমার পূজা করব? তুমি প্রসন্ন না হলে যে আমার গতি নেই।

তোমারে কি দিয়ে পূজি ভগবান।/ বুঝিতে পারি না তাই কাঁদে প্রাণ!

সাধনার পথ যাঁরা নিয়েছেন তাদের মধ্যে এমনি অভিজ্ঞতা প্রায়ই হয় (যদিও সব সময়ে নয়) যে, তারা কোন কবিতা বা গানের মধ্যে লেখকের অন্তর উপলব্ধির স্পন্দন গভীর ভাবে অনুভব করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের, নানা ভক্তির গানেই এই স্পন্দন স্পষ্ট। কিন্তু তার পরেই যে সব কবির নামডাক হয়েছে তাদের সবাই চলেছেন দেখা যায় 'শিল্প শিল্পের জন্য' (art for art's sake) এর মন্ত্র জপ করে তথাকথিত সুন্দরের অভিসারে। কিন্তু শুধু সৌন্দর্যের জন্য সুন্দরের পানে এ অভিসার শিবসত্যের সঙ্গো যোগ না দিলে মানুষ কৃতার্থ হতে পারে না, অল্পের প্রসারীই থেকে যায়। তাই এ জাতীয় সৌন্দর্যসর্বস্বতা তাদের মন টানে না যারা কবিতায় (বিশেষ করে গানে) খোঁজেন অন্তরাত্মার অসীম তৃষ্ণার কোন অভিব্যক্তি। অবশ্য এই শ্রেণীর সন্ধানী কম সব দেশেই। তাই কবিতায় বা গানের ভক্তির বা অসীমাশার কোন পরিচয় না পেলে খুব কম লোকই মনে করেন কোন বড় অভাব রয়ে গেল। কিন্তু যারা ভালবাসেন গানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ অর্থাৎ ভক্তি সঙ্গীত, তারা কেমন করে এই ভাবের দৈন্যকে বরণ করবেন পরম শিল্প বলে? তারা চাইবেনই চাইবেন গানে অন্তরাত্মার এই পরম আকুতি যা যে চারজন কবির নাম করলাম তাদের পরে পাই কেবল কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কাজী ও কবি নিশিকান্তের গানে। নিশিকান্তের তেমন নাম হয়নি। কারণ তিনি ব্যক্তি ছাড়া আর কোন রসের পরিবেশন করেননি বললেই হয়। তার জীবন দর্শন হ'ল (অলকানন্দা)

কবিরে তোমার কহিতে শিখাও গভীর কথা/ দুর করো তার গভীর প্রবাহে প্রমত্ততা।/ কী হবে ভাসায়ে অকারণে সাদা মেঘের ভেলা?/ কী হবে আকাশ কুসুমের রঙে রাঙায়ে বেলা?/ যে কুসুম ফুটে ওঠে আঙিনায়/ তাই দিয়ে যে অর্ঘসাজায়/ তার প্রতিদলে পরশিয়া দাও তন্ময়তা।

কবিরে তোমার গাহিতে শিখাও গভীর কথা। এর ভাষ্য করা যেতে পারে,

আমার সকল খোঁজের যখন হ'ল শেষ, / তোমার অপার আভাষ পেলাম যে এ পরে;/ আলো এ সংসারের ডুবল অন্ধকারে। / আর রইল না তো দ্বন্দ্ব সে লগনে/ যখন উঠল তোমার প্রেম কুসুমি মনে,/ আমার অন্তর গান উঠল গেয়ে যখন / দিলে রাঙা পায়ে ঠাঁই তুমি আমারে;

/ আমার যা কিছু সব লুটে যখন নিলে,/ এ প্রাণ চলল শুধু তোমার অভিসারে।

কাজীরও জীবনে এল এর পরের বিকাশ- গভীর কথা গভীর সুরে বলার পরম অভিসারের লগ্ন। তখন রইল না আর বিপদ ব্যথা, বিরহের আবাহনে মিলনীর আভাষ মিলন হোক না ক্ষণে, কিন্তু মিলন তো, জানিয়ে দিলেন তা তিনি-কাজীর ভাষায় (গীতিশতদল),

সখি যায়নি তো শ্যাম মধুরায়.../ সে যে রয়েছে তেমনি ঘিরে আমায়/ তোমার অন্তরতম আছে অন্তরে, অন্তরালে সে যাবে কোথায়?/ আছে ধেয়ানে স্বপনে জাগরণে মোর/ নয়নের জলে আঁখি তারায়।

সাধন জীবন বিরহ আসে বারবারই মিলনের আভাষ পাওয়ার ঠিক পরেই। এই আভাষ পাওয়ার লগ্ন মনকে মাধুর্যে ভরিয়ে দেয়। কিন্তু এ মর্মার্থের প্রকাশ মর্মস্পর্শী হয়ে কেবল তখন যখন সাধক ন প্রতিভাধর কবি যেমন কাজী এই ধন্য লগ্নে কাজী কয়েকটি অপরূপ গান বেঁধে গেছে– যদি সে কণ্ঠ নীরব না হত তাহলে এমন গান আরও কতই না বাঁধত। কিন্তু যা পাইনি তার জন্যে খেদ রেখে, তার কাছে যা পেয়েছি তারই খবর দেওয়া ভালো– কেন তার কবিকণ্ঠ নীরব হ'ল সে নিয়ে মাথা খামিয়ে লাভ কী? কাজী এই প্রাপ্তির লগ্নে বেঁধেছিল একটা অপূর্ব গান,

বলরে জবা বল/ কোন সাধনায় পেলি শ্যামামায়ের চরণ তল।/ তোর সাধনা আমায় শেখা, জীবন হোক সফল।/ মায়া তরুর বাঁধন টুটে মায়ের পায়ে পড়লি লুটে/ মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ - বিহ্বল/ কোটি গন্ধ কুসুম ফোটে বনে মনোলোভ, কেমনে মার চরণ পেলি তুই তামাসি জবা? তোর ম'ত মার পায়ে রাতুল, হল কবে প্রসীদ ফুল/ কবে উঠে রেঙে মায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগে/ করে তোরই মত রাঙবে মোর মলিন চিত্তদল?

সব কিছুতেই কবি পেতে শুরু করেছেন মায়ের পায়ের পুলক পরশ, যার ফলে তার হৃদয়ে জেগেছে রঙিন হয়ে ওঠার পরম কামনা। কী সুন্দর তথা সত্য উপলব্ধি!

কিন্তু বলেছি, এই উচ্ছল আনন্দের আভাষ স্থায়ী হয় না যতদিন না আাদের প্রকৃতি দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। তাই আসে বিরহ। এরিতো নাম চির পলাতকের লুকোচুরি খেলা সন্ধানীর সঙ্গে। কিন্তু তবু একবার আভাষ পাওয়ার পরে যে বিরহ আসে তারও ছন্দ বদলে যায়। কারণ এ মিলনের আভাষ পেলেও দুনিয়ার চেহারা বদলে যায়। ফলে বেদনা ব্যথা দিলেও আর নিরাশা আনে না। কেননা অন্তর হয়ে ওঠে একান্ত। বিরহিনী লোভী হিয়া তখন আর কিছুই পায় না, শুধু তার একধ্যান একজ্ঞান - গায় সে শুধু দেখা দাও, তার জন্যে কলঙ্ক হয় হোক, সব ছাড়তে হয় ছাড়তে আমি রাজী- কাজীর ভাষায় (গীতিশতদল)

বাজিয়ে বাঁশি মনে বনে এসো কিশোর বংশীধারী! চূড়ায় বেঁধে ময়ূরপাখা, বামে লয়ে রাদা প্যারী।/ আমার আঁধার প্রাণের মাঝে/ এসো অভিসারের সাজে/ নয়ন জলের যমুনারে উজানে বেয়ে ছুটুক বারি।/ এমন চোখে তোমায় আমি দেখতে যদি না পাই হরি/ দেখাও পদ্ম পলাশ-আঁখি! তোমার প্রেমে অন্ধ করি।/ ঘুচাও এবার মায়ার বেড়ী/ পারাও তিলক কলঙ্কেরি,

কাজীর সম্বন্ধে আরো কত কথাই বলার ছিল কিন্তু একটি নিবন্ধে অত ভার সইবে নাই তাই তার ছন্দের কলি, সুরের বৈশিষ্ট্য, আনন্দের নানা রঙ-রূপ, উপলব্ধির হাতছানি অনুসরণ ক'রে ভক্তির অনন্যতন্ত্র গতি আরো কত কী বলা হ'ল বা নাই হ'ল, আরো কত গুণী দরদী রসিক আছেন তারা বলবেন কাজীর এসব কীর্তির কথা। আমি শুধু শেষে কাজীর প্রাণের একটি মূল ধুয়া উদ্ধৃত করে শেষ করি। যার নাম আমি দিতে চাই শাস্ত্রবাণী নয় হৃদয়ের বাণী। কাজী ছিল না বুদ্ধিবাদী। একমাত্র নিকষ ছিল হৃদয়। এখানে তার ভুল হয়নি। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বলেছে যে, সত্য ও শ্রদ্ধার পীঠস্থান মগজ নয় হৃদয়,

হৃদয়েহ্যেব শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিতা ভবিত/হ-দয়ে হ্যেব সত্যং প্রতিষ্ঠিতং ভবিত

এই হৃদয়ের বাণী কাজী তার 'সত্যমন্ত্র' শীর্ষক দীর্ঘ গানটিতে তার বিশিষ্ট বলিষ্ঠ ঢঙে ঘোষণা করেছে– যা পড়তে না পড়তে মন ভরে ওঠে– গান শুনলে নিশ্চয় অভিভূত হয়ে পড়তে হত;

পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর, বিধির বিধান সত্য হোক।/ (এই) খোদার উপর খোদকারি তোর মানবে না আর সর্বলোক।...বিধির বিধান মানতে গিয়ে নিষেধ যদি দেয় আগল, / বিশ্ব যদি কয় পাগল, আছেন সত্য মাথার পর,/ বে-পরোয়া তুই সত্যবল! বুক ঠুকে তুই সত্য বল। (তখন) তোর পথেরই মশাল হয়ে জ্বলবে বিধির রুদ্র চোখ। .....জাতের চেয়ে মানুষ সত্য, অধিক সত্য প্রাণের টান/ প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।/ বিশ্বপিতার সিংহ -আসন প্রাণ বেদীতেই অধিষ্ঠান,/ আত্মার আসন তাই তো প্রাণ/ জাত সমাজের নাই সেথা ঠাঁই, জগন্নাথের সাম্যলোক, জগন্নাথের তীর্থ - লোক! (নজরুল-গীতি অন্বেষা)

.....

এই প্রবন্ধটি নজরুল সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকা ২য় সংখ্যা, বইমেলা ২০০৪ থেকে মুদ্রিত। পত্রিকা সম্পাদক সহ সকলের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। –সম্পাদক 'আত্মবিকাশ' সাহিত্য পত্রিকা।